

অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি

কোনো দেশের অর্থনীতির অবস্থা জানতে হলে সে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট অভ্যন্তরীণ বা দেশজ উৎপাদন ও জনগণের মাথাপিছু আয় জানা প্রয়োজন। এগুলোকে বলা হয় অর্থনীতির নির্দেশক। কারণ, এগুলো অর্থনীতির অবস্থা নির্দেশ করে। দেশের অর্থনীতি পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, নাকি একই অবস্থায় আছে, তা উক্ত নির্দেশকসমূহের মান দ্বারা বোঝা যায়। এগুলোর সাথে সাথে কৃষি, শিল্প, সেবা এবং অন্যান্য খাতে উৎপাদনের অবস্থা কী, বিদেশ থেকে কর্মজীবী মানুষ যে অর্থ দেশে প্রেরণ করছে তা জাতীয় অর্থনীতিতে কেমন প্রভাব ফেলছে— এ সবকিছু বিবেচনা করে দেশের অর্থনীতির অবস্থা ও গতিপ্রবাহ জানা সম্ভব। এই অধ্যায়ে এ সকল অর্থনৈতিক নির্দেশক অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, মোট জাতীয় উৎপাদন, মাথা পিছু আয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি ও এর উল্লেখযোগ্য খাতসহ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমরা অবহিত হব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি), মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জিএনপি ও জিডিপি এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব;
- দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির খাতসমূহের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা করতে পারব;
- ক্ষুদ্র পরিসরে জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রসরতার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্ষকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হব।

অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ

একটি দেশের অর্থনীতি ও অর্থনীতির অবস্থা জানার জন্য সে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন সম্বন্ধে জানা দরকার।

মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভূমির ওপর সে দেশের মোট শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যকে ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে। সেবা বলতে কোনো অবস্তুগত দ্রব্যকে বুঝায় যার উপযোগ এবং বিনিময় মূল্য আছে। শিক্ষকের পাঠদান, চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রদান, ব্যাংকারের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা দান ইত্যাদি সেবা হিসেবে বিবেচিত।

মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ

মোট জাতীয় উৎপাদনকে তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করে পরিমাপ করা যায়—

১. উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা

যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে জনগণের প্রয়োজনের ভিত্তিতে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিভিন্নতার কারণে সবগুলো একত্রে যোগ করে এগুলোর মোট পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাই মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে প্রতিটি দ্রব্য ও সেবার মোট উৎপাদনের পরিমাণকে তার বাজার দাম দিয়ে গুণ করতে হয়। এভাবে প্রাপ্ত প্রতিটি দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। এ পদ্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় করতে হলে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যই গণনা করতে হবে। অনেক দ্রব্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে বাজারে আসার আগে প্রাথমিক দ্রব্য ও মাধ্যমিক দ্রব্য হিসেবে একাধিকবার ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই ক্রয়-বিক্রয় হয় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। দ্রব্যটি উৎপাদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভোগকারী এটি ক্রয় ও ভোগ করে। ভোগকারীর ক্রয়ের পর দ্রব্যটি আর ক্রয়-বিক্রয় হয় না। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক ধাপেই দ্রব্যটির হিসাব করা হলে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ সঠিক হবে না। তাই মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্রব্যটিই হিসাব করতে হবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় এবং কাপড় থেকে শার্ট উৎপাদন করা হলো। এখানে তুলা হচ্ছে প্রাথমিক দ্রব্য, সুতা ও কাপড় মাধ্যমিক দ্রব্য এবং শার্ট চূড়ান্ত দ্রব্য। তুলা, সুতা, কাপড় এবং শার্ট—এই চারটি পর্যায়েই দ্রব্যটির দাম হিসাব করা হলে তা হবে একটি ভুল হিসাব। কারণ শার্টের দামের মধ্যেই তুলা, সুতা ও কাপড়ের দাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন গণনা বা পরিমাপ করতে হলে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্য— যা সরাসরি ভোগ করা হয়, তাই হিসাব করা হয়।

২. উৎপাদনের উপকরণের অর্জিত আয়

এ পদ্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করতে হলে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মোট আয়ের সমষ্টি নির্ণয় করতে হয়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের এ চারটি উপাদানের আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। এক বছরে কোনো দেশের জাতীয় আয় হলো ঐ বছরে উৎপাদনের উপাদানসমূহের অর্জিত মোট খাজনা, মজুরি বা বেতন, সুদ ও মুনাফার সমষ্টি।

৩. সমাজের মোট ব্যয়

সমাজের মোট ব্যয়ের ভিত্তিতেও মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সমস্ত ধরনের ব্যয় যোগ করলে মোট জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্য পাওয়া যায়। কোনো দেশের মোট আয়

দু'ভাবে ব্যয়িত হয়- (i) ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা কেনার জন্য এবং (ii) বিনিয়োগ করার জন্য। ব্যয়কারীদের প্রধানত তিন শ্রেণিতে বিন্যাস করা যায়: সরকার, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণ। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং বেসরকারি ভোগ-ব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়ের সমষ্টি ঐ সময়ে ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন।

কাজ

একক : মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট জাতীয় আয়ের (GNI) মধ্যে পার্থক্য উপাধরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

মোট জাতীয় উৎপাদনকে অনেক সময় মোট জাতীয় আয় বলা হয়। যে কোনো সরল অর্থনীতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product : GNP) ও মোট জাতীয় আয় (Gross National Income: GNI) একই হতে পারে। আমরা জানি, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে উৎপাদিত মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে। কিন্তু এর সঙ্গে সমাজের মোট আয় বা মোট ব্যয়ের সমতা নাও হতে পারে। কারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য ব্যবহৃত মূলধন সামগ্রী যেমন-কশকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে রাখা হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়ের মধ্যে এই অংশটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তাই মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) আর্থিক মূল্য এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) বা জাতীয় আয় এক নয়। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য অনেক সময়ই মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়কে সমার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়।

মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product) : মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে বসবাসকারী সকল জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি। এতে উক্ত সীমানার মধ্যে বসবাসকারী দেশের সকল নাগরিক ও বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বিদেশে অবস্থানকারী ও কর্মরত দেশের নাগরিক বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কাজ

একক: কোনো নির্দিষ্ট বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য ২১,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঐ দেশে বসবাসকারী বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ২,০০০ কোটি টাকা। ঐ একই বছরে উক্ত দেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী দেশের নাগরিকদের মোট উৎপাদনের আর্থিক মূল্য ৪,৫০০ কোটি টাকা। দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) ও মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) নির্ণয় কর।

যদি X দ্বারা আমরা বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয় বুঝাই এবং M দ্বারা দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বুঝাই তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) + $(X-M)$ । মোট দেশজ উৎপাদন বুঝতে হলে মোট জাতীয় উৎপাদন বা GNP এর ধারণাটিও মনে রাখতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের জনগণ মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ও কর্মরত বিদেশি ব্যক্তি ও সংস্থার উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে বিদেশে বসবাসকারী ও কর্মরত দেশি নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) শুধু দেশের নাগরিকদের উৎপাদন হিসেবে গণনা করে। এ নাগরিকেরা দেশে অথবা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, এক্ষেত্রে নাগরিকই গুরুত্বপূর্ণ।

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলতে শুধু দেশের সীমানার ভিতরের মোট উৎপাদনকে বুঝায়। এটা দেশের নাগরিক বা বিদেশি ব্যক্তি যাদের দ্বারা উৎপাদিত হোক না কেন, এক্ষেত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমানার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ।

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) -এর চেয়ে বেশি বা কম হতে পারে, আবার সমানও হতে পারে।

তবে সাধারণত GNP, GDP-এর চেয়ে বেশি বা কম হয়, সমান হয় না।

মাথাপিছু আয় (per Capita Income) : মাথাপিছু আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের নাগরিকদের গড় আয়। মাথাপিছু আয় দুটি পৃথক মান দ্বারা নির্ধারিত হয় : (১) মোট জাতীয় আয় এবং (২) মোট জনসংখ্যা।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে (GNI) সে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয়কে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

সংকেতের সাহায্যে মাথাপিছু আয় প্রকাশ করলে আমরা পাই :

$$\bar{Y} = \frac{Y}{P}$$

যেখানে \bar{Y} = মাথাপিছু আয়

Y = মোট জাতীয় আয়

P = মোট জনসংখ্যা

ধর, ২০১১ সালের মধ্য সময়ে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি এবং ঐ সময়ে মোট জাতীয় আয় ৭০০০ কোটি মার্কিন ডলার।

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং ঐ সময়ে দেশটির মাথাপিছু আয় } (\bar{Y}) &= \frac{৭০০০ \text{ কোটি মার্কিন ডলার}}{১৪ \text{ কোটি}} \\ &= ৫০০ \text{ মার্কিন ডলার} \end{aligned}$$

কাজ

একক : ২০১৩ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি এবং ঐ সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদন ৮০০০ কোটি মার্কিন ডলার হলে দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় বের কর।

মাথাপিছু আয় ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। উচ্চ মাথাপিছু আয় উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করে। তবে জীবনমান নির্ধারণের জন্য উচ্চ মাথাপিছু আয়ের সাথে দ্রব্যমূল্যের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। যদি কোনো বছরে কোনো দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়ে যায়, আবার একই সাথে দ্রব্যের মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার মান একই থাকবে। কারণ ঐ দ্বিগুণ আয় দিয়ে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একই পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারবে। অর্থাৎ তার আর্থিক আয় দ্বিগুণ হলেও তার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়নি। কারণ, আর্থিক আয় ও দ্রব্যমূল্য একই হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থেকে মাথাপিছু আয় বাড়লে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং মাথাপিছু আয় কমলে জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাবে।

আবার, জাতীয় আয়ের বর্টন যদি সুখম না হয় তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়লেও অধিকাংশ জনগণের জীবনমান নিচুই থাকে। কারণ, মাথাপিছু আয় একটি গড় মান। জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি অথচ বৃহদাংশের আয় অনেক কম হলেও উভয় অংশের মাথাপিছু আয়ের গড় মান এমন হতে পারে যাতে মনে হয় যে, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু মোট জাতীয় আয়ের এ রকম অসম বন্টন হলে বেশিরভাগ মানুষের মাথাপিছু আয় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের চেয়ে কম হবে। ফলে অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রাও উন্নত হবে না। তবে যে দেশে জাতীয় আয়ের সুখম বন্টন আছে, সেসব দেশে মাথাপিছু আয় বাড়লে এবং মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থাকলে বা আয় বৃদ্ধির চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাবে।

২০২২-২০২৩ চলতি মূল্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ২,৭৩,০০০ টাকা এবং মার্কিন ডলার হিসেবে ২,৭৪৯ ডলার। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২৪ অনুযায়ী)

জাতীয় অর্থনীতির খাতসমূহ ও মোট দেশজ উৎপাদনে এগুলোর অবদান

অর্থনীতির খাত বলতে বোঝায় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশ, বিভাগ বা শাখা। বিশ্বের যে কোনো অর্থনীতিকে প্রধান তিনটি খাতে ভাগ করা হয় : কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত। ভূমি ও ভূমি থেকে উৎপন্ন সবকিছু – শস্য ও ফলমূল, শাকসবজি, বনজ সম্পদ, পশু ও মৎস্যসম্পদ প্রভৃতি কৃষিখাতের অন্তর্গত। বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, সব ধরনের নির্মাণ, খনিজ দ্রব্যাদি সংক্রান্ত সকল কাজ শিল্প খাতের অন্তর্গত। অবশিষ্ট সকল ক্ষেত্র, যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, ব্যাংক, বিমা, হোটেল–রেস্তোরাঁ, ডাক, তার, যোগাযোগ ও পরিবহন–এসব কিছুই সেবা খাতের আওতাধীন। তবে বিভিন্ন দেশে বাজেট বরাদ্দ এবং কাজ করার সুবিধার জন্য এ তিনটি প্রধান খাতের প্রত্যেকটিকে আবার কিছু সংখ্যক উপখাতে ভাগ করা হয়। যে কোনো দেশের অর্থনীতিকে বেশকিছু খাতে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মোট ১৯টি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়। এই ১৯টি খাত হচ্ছে:

১. কৃষি, বনজ ও মৎস্য সম্পদ
২. খনিজ ও খনন
৩. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)
৪. বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
৫. পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম
৬. নির্মাণ
৭. পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা; যানবাহন ও মোটর সাইকেল মেরামত
৮. পরিবহন এবং সংরক্ষণ
৯. আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম
১০. তথ্য ও যোগাযোগ
১১. আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম
১২. রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম
১৩. পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম
১৪. প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক পরিষেবা কার্যক্রম
১৫. জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা
১৬. শিক্ষা
১৭. মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম
১৮. শিল্পকলা ও বিনোদন
১৯. অন্যান্য সেবা কার্যক্রম

তবে এ ১৯টি খাতকে ৩টি বৃহত্তর খাতে সমন্বিত করা যায়, যেমন– কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত।

কৃষিখাত : কৃষিখাতে রয়েছে কৃষি ও বনজ। বৃহত্তর অর্থে মৎস্যসম্পদও কৃষিখাতের অন্তর্গত।

শিল্প ও বাণিজ্যখাত : শিল্পখাতের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প। তবে বৃহত্তর অর্থে খনিজ ও খনন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসম্পদ এবং নির্মাণ–এই খাতগুলোকেও শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য এবং রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসায়–এ খাতের আওতা পড়ে।

সেবাখাত : হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা (ব্যাংক ও বিমা) ইত্যাদি সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা; কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা এগুলো এ খাতের আওতাভুক্ত।

মোট দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির ১৯টি বিভিন্ন খাতের অংশ বা অবদান সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-১

মোট দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির খাতওয়ারি অবদানের হার (২০২২-২০২৩)

ক্রমিক নং	অর্থনীতির খাত	মোট দেশজ উৎপাদনে অবদান (শতাংশে)
ক.	কৃষিখাত	১১.৩০
১.	কৃষি, বনজ ও মৎস্য সম্পদ	১১.৩০
খ.	শিল্পখাত	৩৭.৬৫
২.	খনিজ ও খনি	১.৮৭
৩.	শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	২৪.৮৯
৪.	বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	১.১৯
৫.	পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম	০.১০
৬.	নির্মাণ	৯.৬০
গ.	সেবাখাত	৫১.০৫
৭.	পরিবহন ও খুচরা ব্যবসা; যানবাহন ও সেটির সাইকেল মেরামত	১৫.২৬
৮.	পরিবহন এবং সংরক্ষণ	৭.২৯
৯.	আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম	১.০৭
১০.	তথ্য ও যোগাযোগ	১.২৬
১১.	আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম	৩.০৭
১২.	রিটেল এন্ডেট কার্যক্রম	৭.৯২
১৩.	পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	০.১৭
১৪.	প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক পরিবেশ কার্যক্রম	০.৭৩
১৫.	জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা	০.৪৮
১৬.	শিক্ষা	২.৬৮
১৭.	মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম	০.৪৩
১৮.	শিল্পকলা ও বিনোদন	০.১৪
১৯.	অন্যান্য সেবা কার্যক্রম	৪.৫৪

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪, অর্থ মন্ত্রণালয়

কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা

আমরা জানি, যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক সে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়। তবে একটি দেশ উন্নত, অনুন্নত নাকি উন্নয়নশীল, তা নির্ধারণের জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় ছাড়াও আরও বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, অর্থনীতির প্রকৃতি অর্থাৎ অর্থনীতি কৃষিপ্রধান না কি এর শিল্পায়ন ঘটেছে, সাক্ষরতার হার, জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা, অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখী উন্নয়ন ঘটেছে কিনা অর্থাৎ পরিবহন, যোগাযোগ সুবিধা এবং মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের হার উর্ধ্বমুখী কিনা এসবও বিবেচ্য বিষয়।

তবে বিশ্বব্যাপক মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে। এগুলো হলো: উচ্চ আয়ের দেশ (High Income Countries), মধ্য আয়ের দেশ (Middle Income Countries) এবং নিম্ন আয়ের দেশ (Low Income Countries)। মধ্য আয়ের দেশগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ (Upper Middle Income Countries) এবং নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ (Lower Middle Income Countries)।

কাজ
একক : মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান নির্ণয় কর।
দলগত : উপরের সারণিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির মোট ১৯টি খাত এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (২০২২-২০২৩) এগুলোর শতকরা অংশ দেখানো হয়েছে। একক খাত হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনে খাতসমূহের অংশের ভিত্তিতে এই ১৯টি খাত ক্রমানুসারে একটি সারণিতে উপস্থাপন কর।

নিচে আয়ভিত্তিক শ্রেণিগুলো দেখানো হলো :

সারণি-২
মাথাপিছু জিএনআই ভিত্তিতে
কতিপয় দেশের শ্রেণিবিন্যাস (২০২৩)

নং	আয়ভিত্তিক শ্রেণি	দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মাথাপিছু জিএনআই (ইউএস ডলার)
১	২	৩	৪	৫
(১)	উচ্চ আয়ের দেশ (১৩৮৪৫ ডলারের বেশি)	যুক্তরাষ্ট্র	৩৩৩.৯	৮০৩০০
		কানাডা	৪০.০	৫৩৯৩০
		যুক্তরাজ্য	৬৮.৩	৪৭৮০০
		নরওয়ে	৫.৫	১০২৪৬০
		সুইডেন	১০.৫	৬১৬৫০
		জাপান	১২৪.০	৩৯০৩০
		সিঙ্গাপুর	৫.৯০	৭০৫৯০
(২)	মধ্য আয়ের দেশ (১১৩৬-১৩৮৪৫ ডলার)	(ক) উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ (৪৪৬৬-১৩৮৪৫ ডলার)	চীন	১৪১০.০
			ইরান	৮৯.০
			মালয়েশিয়া	৩৪.০
			তুরস্ক	৮৫.০
			থাইল্যান্ড	৭১.০
		(খ) নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ (১১৩৬-৪৪৬৫ ডলার)	ভারত	১৪২৮.০
			বাংলাদেশ	১৭২.০
			মিশর	১১২.০
			নাইজেরিয়া	২২৩.০
			পাকিস্তান	২৪০.০
			কেনিয়া	৫৫.০
(৩)	নিম্ন আয়ের দেশ (১১৩৫ ডলার অথবা তার কম)	নাইজার	২৭.০	৬০০
		উগান্ডা	৪৮.০	৯৮০

উৎস : ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট, ২০২৩

উপরের সারণি-২ লক্ষ কর। সারণিটিতে ২০২৩ সালে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বেশকিছু দেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এগুলো হলো উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশ। মধ্য আয়ের দেশকে আবার উচ্চ মধ্য আয় ও নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এ তথ্য বিশ্বব্যাংক তার ২০২৩ এর রিপোর্টে দেখিয়েছে।

উচ্চ আয়ের দেশসমূহ উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃত। উন্নয়ন প্রক্রিয়া শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছানোর ফলেই এসব দেশ এই উন্নত অবস্থা অর্জন করেছে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় এমন যে জনগণের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের পরও প্রচুর অর্থ উত্তৃত থাকে-যা সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে ব্যয় হয়। এসব দেশ উত্তৃত অর্থ দিয়ে অধিকতর উন্নয়ন কার্যক্রম চালায় এবং উন্নয়নশীল ও অনূন্নত দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করে। উপরের সারণি-২ তে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ এবং এশীয় দেশসমূহের মধ্যে জাপান ও সিঙ্গাপুর ‘উচ্চ আয়ের দেশ’ শ্রেণিভুক্ত।

মধ্য আয়ের দেশসমূহ সাধারণত উন্নয়নশীল দেশ। তবে মধ্য আয়ের ২টি ভাগের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোর অবস্থান উন্নত। এসব দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা অনেকটাই পূরণ হয়েছে। দেশগুলো দ্রুত শিল্পায়িত হচ্ছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো সামাজিক অবকাঠামোর দ্রুত উর্ধ্বমুখী উন্নয়ন ঘটছে। তবে উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ের পৌছাতে এসব দেশকে এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। উপরের সারণিতে অন্তর্ভুক্ত উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় ৪৬৮০ ডলার থেকে ১৩৪০০ ডলার পর্যন্ত। এদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক ও থাইল্যান্ড। ‘মধ্য আয়ের দেশ’ শ্রেণির নিচের ধাপে রয়েছে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ। এগুলোও উন্নয়নশীল দেশ। সারণিতে ‘নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ’ হিসেবে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিশর, নাইজেরিয়া ও কেনিয়া-এ সাতটি এশীয় ও আফ্রিকান দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১৫০০ ডলার থেকে ৩৯০০ ডলার পর্যন্ত। মাথাপিছু জাতীয় আয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচে রয়েছে ‘নিম্ন আয়ের দেশ’। এ দেশগুলোকে কোনো কোনো সময় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও মূলত এগুলো অনুন্নত দেশ। তবে এসব দেশের অধিকাংশে উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে বেশ কিছুকাল থেকেই। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশগুলো কিছুটা উন্নয়নও অর্জন করেছে। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রেই এদেশগুলোকে অনুন্নত না বলে স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়। সারণিতে এই শ্রেণিতে এশীয় দেশের মধ্যে নাইজার এবং আফ্রিকান দেশের মধ্যে উগান্ডাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। সারণিতে অন্তর্ভুক্ত ‘নিম্ন আয়ের দেশ’ সমূহের মাথাপিছু আয় ৬০০ ডলার থেকে ১০০০ ডলারের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ২৭৪৯ ডলার।

কাজ
একক : মাথাপিছু মোট জাতীয়
আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর
দেশগুলো শ্রেণিবিন্যাস করা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

কোনো দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রধানত সে দেশের অর্থনীতির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। অর্থনীতির প্রকৃতি আবার দেশের ভূপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনগণের শিক্ষা ও দক্ষতার স্তর এবং তাদের উদ্যম ও উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা-এ সবকিছুর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই একটি কৃষিপ্রধান বা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। এ পাঠে আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানব।

১. কৃষিপ্রধান অর্থনীতি : অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান অর্থনীতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতসহ কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১১.৩০ শতাংশ। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৫.০০ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। দেশের রপ্তানি আয়েও কৃষি খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। খাদ্যশস্য কৃষিখাতের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন ক্রমবর্ধমান এবং জনসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। এতদ সত্ত্বেও দেশটি ক্রমশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। এছাড়া আমাদের শিল্পখাতের অনেক কাঁচামালের যোগান দেয় আমাদের কৃষি খাত, যেমন- পাট শিল্প, চা, চামড়া শিল্প ইত্যাদি। এসব কারণেই কৃষিখাত এখন পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত।

২. কৃষিখাতের প্রকৃতি : কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ খাত। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ। তবে এখন এত গুরুত্বপূর্ণ হলেও কৃষি উৎপাদন প্রণালি এখনও সম্পূর্ণ আধুনিক হয়ে ওঠেনি। চাষাবাদের আওতাধীন জমির বৃহদাংশ এখনও পর্যন্ত সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ চলছে। এর ফলে কৃষিজমির উৎপাদনশীলতাও কম।

কাজ
দলগত : বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এখন পর্যন্ত কৃষিপ্রধান অর্থনীতি বশর কারণগুলো চিহ্নিত কর।

এছাড়া এদেশের কৃষি প্রকৃতিনির্ভর। বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ কৃষি উৎপাদনের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হলে বা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে উৎপাদন বিপুল পরিমাণে কমে যায়।

কৃষিখাতের আরেকটি বড়ো ঝুঁকি হলো কৃষক বা কৃষি মজুরদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া সবক্ষেত্রে নিশ্চিত করা যায় না। এছাড়া পরিবহন সুবিধার অপ্রতুলতা ও বাজারব্যবস্থার ঝুঁকির কারণে প্রকৃত উৎপাদকেরা অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পায় না। এ বিষয়টি দেশের সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে একটি বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৩. শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের গুরুত্ব ও অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে শিল্পের মূল্যে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ১৭.৩১ শতাংশ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩৭.৬৫% এর বেশি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্প, খনিজ ও খনন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।

৪. শিল্পখাতের প্রকৃতি : মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ক্রমবর্ধমান হলেও আমাদের শিল্পখাতে মৌলিক ও ভারী শিল্পের (Basic and Heavy Industries) অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সার কারখানা, চিনি ও খাদ্যশিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাটশিল্প, চামড়াশিল্প, তৈরি পোশাকশিল্প প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দ্রুত শিল্পায়ন প্রয়োজন। এজন্য ভারী বা মৌলিক শিল্প, যেমন-লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, অবকাঠামোর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানি শিল্প ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। দেশে ভারী যানবাহন সংযোজন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও জলযান নির্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি শিল্প রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলোও অপ্রতুল।

৫. জনসংখ্যাধিক্য ও শিক্ষার নিম্নহার : বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জনসংখ্যাধিক্য। এদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬,৯৮,২৮,৯১১ জন। জনবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১১৯ জন (জনশুমারি-২০২২)। কিন্তু ২০২৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৭১ জন বাস করেন। বাংলাদেশ জনসংখ্যাধিক্যের দেশ হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান।

তবে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উভয়ই তার প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

কাজ

একক : 'বাংলাদেশে জনসংখ্যাধিক্য রয়েছে।' - উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

জনসংখ্যাকে দেশের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে জনসংখ্যা এখন পর্যন্ত একটি সমস্যা। এর কারণ বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৭.৯। অর্থাৎ ২২.১ শতাংশ জনগণ নিরক্ষর।

নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, এদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে উদ্যোগী করে তোলা, মূলধনের জোগান দেওয়া, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি রাষ্ট্রের জন্য একটি বড় চাপ সৃষ্টি করছে।

৬. বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্ব: জনসংখ্যাধিক্য এবং দ্রুত শিল্পায়নের অভাব দেশে বেকারত্বের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বেকার। দেশে মজুরির হার কম বলে দিনমজুরদের অধিকাংশকে অর্ধ বেকার হিসেবে গণ্য করা যায়।

৭. স্বল্প মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান : মজুরির নিম্নহার, ব্যাপক বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের ফলে জনগণের গড় আয় অর্থাৎ মাথাপিছু আয় কম। বাংলাদেশে ২০২২-২০২৩ সালে মাথাপিছু আয় ২৭৪৯ মার্কিন ডলার। নিম্ন মাথাপিছু আয়ের কারণে জীবনযাত্রার মানও নিম্ন। দেশের ১৮.৭ শতাংশ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ জনগণের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে।

৮. সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার: মাথাপিছু আয় নিম্ন হওয়ায় জনগণের সঞ্চয়ের হার কম যা জিডিপি ৩১.৮৬%। তাই মূলধন বা পুঁজি গঠনের এবং উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের হারও কম। আবার বিনিয়োগের নিম্নহারের কারণে নতুন শিল্প স্থাপনের গতি মন্দ। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের হারও কম। বাংলাদেশ এমনই একটি দারিদ্র্যের চক্রের মধ্যে আবদ্ধ। তবে এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকার পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৯. অবকাঠামোর দুর্বলতা : অবকাঠামো প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়:- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ইত্যাদি সামাজিক অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা (ডাক ও টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ইত্যাদি), পরিবহন (স্থল, পানি ও আকাশপথে), আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, বিমা প্রভৃতি), শিল্পের জন্য ঋণদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সরবরাহ, বাঁধ ও সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। এই আর্থসামাজিক অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ। অবকাঠামো উন্নত না হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করা যায় না। বাংলাদেশে এই অবকাঠামো অনুন্নত ও অপরিপাক।

১০. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা : আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের ওপর বাংলাদেশ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। তবে বিগত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বৈশ্বিক বিভিন্ন পরিবর্তনজনিত কারণে বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ ও অনুদান প্রাপ্তি ক্রমশ কমে আসছে।

১১. বৈদেশিক বাণিজ্য : বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রধানত স্বল্পমূল্যের কৃষিজাত পণ্য- চা, কাঁচাপাট; শিল্প পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার, চামড়া, পাটজাত দ্রব্য, সিরামিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি ও শ্রমিক রপ্তানি করে। কিন্তু বাংলাদেশের আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে উচ্চমূল্যের মূলধনসামগ্রী (কম্পকক্স, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি); জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম এবং খাদ্য ও বিলাসদ্রব্য (রঙিন টেলিভিশন, গাড়ি, প্রসাধনসামগ্রী ইত্যাদি)। বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরেই রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম। ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে।

১২. প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উর্বর কৃষিজমি, নদ-নদী, প্রাকৃতিক জলাশয় এবং ভূগর্ভস্থ খনিজসম্পদ। খনিজ সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, চূনাপাথর, সিলিকা, বালু, সাদা মাটি, চীনা মাটি, কঠিন শিলা ইত্যাদি।

প্রধানত যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ এখনও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণে জনগণের বড়ো একটি অংশ খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার শিকার। কৃষিক্ষেত্রে মাত্রার বিজ্ঞান শিক্ষা, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। এসব কারণে বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকেই মানবসম্পদে রূপান্তর করা এখনও সম্ভব হয়নি। এর ফলে প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদের সম্পূর্ণ পরিমাপ জানা ও এগুলোর পূর্ণ ব্যবহারও এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রতিকল্পকতাসমূহ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জেনেছি। আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত, তবে শিল্পখাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো অপরিপাক ও অনুন্নত।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ নিহিত রয়েছে আমাদের ইতিহাসের গভীরে। আমাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিকভাবে এত অনগ্রসর এবং সমস্যা জর্জরিত, তার দুই শতাব্দীকাল বিস্তৃত একটি পটভূমি রয়েছে। এই পটভূমি রচিত হয়েছে প্রায় দুইশ' বছরব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন আমলে।

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার পটভূমি : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ প্রায় দুইশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিহাসকে ৪টি পর্বে ভাগ করা যায়- প্রাচীন বাংলা, মুসলিম শাসনামল, ব্রিটিশ শাসনকাল ও পাকিস্তানি আমল। প্রাচীন বাংলায় কৃষি উৎপাদনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল। শিল্প ক্ষেত্রে ধাতবশিল্প, কার্শিল্প ও বস্ত্রশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল।

মুসলিম শাসনামল ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ। এ সময়ে কৃষি, শিল্প, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সবল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছিল। বাংলার শিল্পজাত পণ্য বিশেষত বস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ সমাদৃত ছিল। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলায় ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী অব্যাহতভাবে এদেশে শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। কৃষিক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা ও বাধ্যতামূলক নীলচাষ প্রবর্তনের ফলে কৃষি ও কৃষকসমাজ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলিম শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ছিল। প্রতিবেশী দেশসমূহসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতেও বাংলাদেশের বিস্তৃত রপ্তানি বাণিজ্য ছিল। কৃষিপণ্যের সাথে বাংলাদেশ শিল্পপণ্যেরও বড়ো রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিগণিত হতো। ইংরেজরা সকল ব্যবসায়-বাণিজ্য নিজেদের কৃষ্টিগত করে। এ সময় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটায় ফলে যন্ত্রযুগের শুরু হয়। ইংল্যান্ডের বস্ত্রকলে কম খরচে উৎপাদিত বস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশের বাজার দখল করার ফলে বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্প ধ্বংস হয়। এভাবে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যের বাজারে পরিণত হয়। এই ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাদেশ কৃষি ও শিল্পপণ্য রপ্তানির পরিবর্তে শুধু কাঁচামাল রপ্তানিকারক

বাক্স

দলগত : বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার সাথে ১৭৫৭-১৯৭১ সময় কালকে কীভাবে তুলনা করবে?

দেশে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের ভারসাম্য বাংলাদেশে অব্যাহত ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশে বিভক্ত হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি শাসনামল। পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমানের বাংলাদেশ ছিল তদানীন্তন পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে নানাভাবে শোষণ করে। চাকরি, সম্পদ বণ্টন, বাজেট বরাদ্দ, সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্যের অংশ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চরম বঞ্চনার শিকার হতে হয়। প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য ছিল। এভাবে দুইশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে (১৭৫৭-১৯৭১) ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চলার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে এক সময়কার বিশ্বে অগ্রণী দেশ বাংলাদেশ একটি পরনির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশ এই পরনির্ভর অর্থনীতির উত্তরাধিকার লাভ করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য ভিত্তি প্রস্তুতেই আমাদের দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়।

২. কৃষিক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ : আমাদের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে। কৃষিকাজে উন্নত বীজ, সার, সেচ সুবিধা এবং আধুনিক চাষপ্রণালি প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবে কৃষিকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগণের একটি অংশের কাছে কৃষি সুবিধাগুলো এখনও পৌঁছেনি। কৃষি উন্নয়নের জন্য সুলভ কৃষিঋণ একটি বড়ো উপাদান। কৃষিঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার অপর্ধ্যাপ্ততার কারণে বহু কৃষকের কাছে কৃষিঋণ এখনও সুলভ নয়। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রসরতার সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক অবকাঠামোর দুর্বলতা। সেচ সুবিধা, বীজ ও সারের অপর্ধ্যাপ্ততা এবং যথাসময়ে প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, বিদ্যুতের অভাব, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে পরিবহনের উচ্চ ব্যয়, পণ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাত করে রাখার সুবিধার অভাবে উৎপাদন কম হয়। আবার উৎপাদন পর্যায় থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্যের ফলে প্রকৃত উৎপাদকেরা পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা উৎপাদনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং নতুন উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হয় না। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে এসব প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশকে বলা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে একটি বড়ো বাধা। প্রতিবছরই এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যা, খরা, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে দুর্যোগকবলিত হয়। এসব দুর্যোগ কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির কারণ।

৩. শিল্পক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাত ক্রমশ সম্ভ্রসারিত হচ্ছে। তবে শিল্পখাতের মৌলিক বা ভিত্তিমূলক শিল্প (Basic Industries) নেই বলে শিল্পখাত খুব দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারছে না। ভারী শিল্প, যেমন—লোহা ও ইস্পাত শিল্প, ভারী যানবাহন শিল্প, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিষয়ক শিল্প ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল।

অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দুর্বলতাও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি বড়ো বাধা। প্রয়োজনীয়সংখ্যক স্থল, নৌ ও বিমানবন্দরের অভাব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও গ্যাসের উচ্চমূল্য, এগুলো উৎপাদন ও সরবরাহে অপর্ধ্যাপ্ততা, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদির অপ্রতুলতা ও অনুন্নত অবস্থা নতুন শিল্প স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধির বড়ো প্রতিবন্ধক।

ব্যাংক ঋণ সুবিধা শিল্পখাত উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় ঋণসুবিধা অপ্রতুল। নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে, এমন ঋণ সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ কম। এছাড়া ঋণ ব্যবস্থাপনাও খুব সুস্থ নয়।

দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শিল্পখাতের উন্নয়নের অনুকূল নয়। রাজনৈতিক কর্মসূচি যেমন- হরতাল, বিক্ষোভ, অবরোধ ইত্যাদি শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শ্রমিকদের আয় কমে যায়। উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। উৎপাদিত পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এতে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে ও শিল্পমালিকদের আয় কমে যায়। ফলে নতুন উদ্যোগ ও বিনিয়োগ করার প্রবণতাও হ্রাস পায়।

৪. আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ: আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দুর্বলতা ও অপব্যবস্থার বিষয়টি। প্রথমে ধরা যাক যোগাযোগের দিকটি। যোগাযোগের মধ্যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। ইলেকট্রনিক যোগাযোগ সুবিধা এখনো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে রয়েছে। পরিবহন (আকাশ, স্থল ও জলপথে) সুবিধার দুর্বলতা ও অপব্যবস্থার কারণে যাতায়াত ও পণ্য উৎপাদন ও বিপণন কঠিন পতি পায় না। জ্বালানি ও শক্তির ক্ষেত্রে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ ও অপব্যবস্থার। ফলে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর একটি বড়ো উপাদান মূলধন যোগানের জন্য উৎপাদন ও বিনিয়োগকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান। ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের মোট ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও বিনিয়োগ প্রতিরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

এরপরে আসে সামাজিক অবকাঠামো প্রসঙ্গ। সামাজিক অবকাঠামোগত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে দেশের ব্যাপক জনগণের নিরক্ষরতা। শিক্ষিত ও সাক্ষর জনগণও দেশের উন্নয়নে আশানুরূপ অবদান রাখতে পারে না। এর কারণ শিক্ষা অনেকটাই পুঁথিগত ও জ্ঞানভিত্তিক। অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতাও শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে না। তবে বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার এই দুর্বলতা, জনগণের সাক্ষরতার নিম্নহার এবং কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাবের ফলে সাধারণ শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কম। এর সাথে পুষ্টিহীনতা ও সুস্বাস্থ্যের অভাব উৎপাদনশীলতা আরও কমিয়ে দেয়। শ্রমিক ও জনগণের মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণের আগ্রহ ও সাধ্যও কম। এসব কিছুই অর্থনীতির সকল খাত বিশেষত শিল্পখাতের অগ্রসরতাকে অনেকটাই বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে।

যদিও নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তবুও সমাজের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারী এখনও অনগ্রসর। দেশের জনগণের অর্ধেকই নারী। এই পশ্চাৎপদতার ফলে নারীরা কর্মক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে। সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীদের ভূমিকা খুব কম। এর ফলে ব্যাপকভাবে বাল্যবিবাহ, পারিবারিক সহিংসতা, অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্মদানের ঘটনা ঘটছে।

কাজ

একক : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক জনসংখ্যাধিক্য ও এর থেকে সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যা। জনসংখ্যাধিক্যের কারণে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রেই সরকারকে বাড়তি চাপ মোকাবিলা করতে হয়।

জনসংখ্যা সমস্যা থেকে সৃষ্ট আরেকটি বড়ো সমস্যা বেকারত্ব। দেশের শ্রমশক্তির একটি বড়ো অংশ বেকার বা অর্ধবেকার। এর ফলে মাথাপিছু আয় কম হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হারও নিম্ন। ফলে নতুন শিল্প স্থাপনের হারও কম।

বেকারত্ব অনেক সামাজিক সমস্যারও জন্ম দেয়। বেকার কিশোর ও তরুণেরা সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এতে সমাজজীবন পূর্নদস্ত হয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫. সুশাসনের অভাব ও দুর্নীতি : স্বাধীনতার পর নানা কারণে দেশের শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র দৃঢ় হয়ে উঠতে পারেনি। স্বাধীনতাউত্তর একটি বড়ো সময়কাল দেশে সামরিক শাসন চলেছে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ফলে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক বেকারত্ব, অসন্তোষ ও অস্থিরতা রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মরতদের মধ্যে একটি বড়ো প্রভাবশালী অংশ দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ দুর্নীতি, সামাজিক অস্থিরতা এবং সুশাসনের অভাবের কারণে দেশের শিল্প ও সেবাখাতে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সরকার এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

৬. প্রকৃতিসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা : প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনা। বলা হয়, বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ কবলিত দেশ। প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, নদীভাঙন প্রভৃতি। এই দুর্যোগগুলো প্রধানত দেশের কৃষিখাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়া বাড়িঘর, পথঘাট ও গাছপালায় ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বিশেষত প্রতিবছর বন্যা ও নদীভাঙনে সীমিত কৃষি জমির এই দেশের বিপুল পরিমাণ জমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষের প্রাণহানির পাশাপাশি গবাদিপশু, মৎস্য ও পাখিসম্পদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতিপূরণ দিয়েই প্রতিবছর আবার উৎপাদন কাজ শুরু করতে হয়।

উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ ও এসব দেশের অর্থনীতি

কোনো দেশের অর্থনীতির উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল অবস্থা বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাকে বলে।

উন্নয়ন ধারণা

উন্নয়ন বলতে বুঝায় বিদ্যমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। উন্নয়ন হলো সমৃদ্ধি বা সার্বিক মানোন্নয়ন। দেশের সম্পদ ও সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়। সম্পদ বলতে দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ উভয়কে বোঝায়। উন্নয়ন অর্জনের প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থনেরও প্রয়োজন হয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেতে হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি বুঝতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth) এ দুটিকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ দুটি এক নয়, কিছুটা পার্থক্য আছে।

কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে প্রবৃদ্ধির হার বলা হয়। প্রবৃদ্ধি হার হচ্ছে জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের হার। প্রবৃদ্ধির হারের সাথে জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্যস্তর বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ধারণ করা হয়। এখানে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া হয়।

কোনো দেশের প্রবৃদ্ধির হার যদি ২% হয় এবং সে দেশের জনসংখ্যাও যদি ২% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে না। কারণ, প্রবৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একই হলে মাথাপিছু আয় একই থাকবে। যদি প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলেই মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে। তবে এর সাথে দ্রব্যমূল্যস্তর পরিবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।

ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট বছরে কোনো দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ৫% বেড়েছে। একই সময়ে সে দেশের দ্রব্যমূল্যও ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারবে না। অর্থাৎ তাদের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পেলেও তাদের প্রকৃত আয় বাড়েনি। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে বলা যাবে না। দ্রব্যমূল্য স্থির থেকে যদি মাথাপিছু আয় বাড়ে অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হয়, তাহলেই প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃত মাথাপিছু আয় দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা যাবে।

কোনো দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধির সাথে দীর্ঘ সময় ধরে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। এই অব্যাহত প্রকৃত আয় বৃদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কোনো দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন।

অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের আওতায় ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হয়। দ্রব্য ও সেবার বিপণন ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটে। একই সাথে উৎপাদনে উন্নততর প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়।

কাজ
একক : 'প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন এক নয়।'-
উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

উৎপাদিত সম্পদ বা জাতীয় আয় বণ্টনে বৈষম্য বা অসমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ফলে উৎপাদনের উপাদানসমূহ বিশেষত শ্রমিক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক বা মজুরি লাভ করে। এতে জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য দেশের সকল জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও আয়ের সুখম বণ্টন এই কল্যাণ নিশ্চিত করে।

এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে সুশাসনের সুফল, শিক্ষার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সকল জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। এতে জনগণের জীবনমানে উন্নয়ন ঘটে। জনগণ উন্নত জীবনযাত্রার সুবিধা উপলব্ধি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে যায়।

অর্থনীতির প্রকৃতিগত পরিবর্তন বলতে কৃষিপ্রধান অবস্থা থেকে শিল্পপ্রধান অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়াকে বোঝায়। এর ফলে দেশ গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে শহরভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। জনগণের আয় বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার এবং বিনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ক্রমাগত উন্নতি হতে থাকে। এই সার্বিক উন্নত অবস্থাকে বলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক বিষয়।

কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমাগত উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে সে দেশের জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় আয়ের সুখম বণ্টন নিশ্চিত হলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়: উন্নত দেশ, অনূন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশ।

কিন্তু এ ধরনের উন্নয়ন বা আয়বৃদ্ধির কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া প্রকৃতির ক্ষতি বা দূষণ হলে তাকে আর উন্নয়ন বলা যায় না। এমন অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো গত উন্নয়ন আসলে উন্নয়নের ধারাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। এমন উন্নয়ন সার্বজনীন হয়না, টেকসইও হয় না। উন্নয়ন যে বৈষম্য সৃষ্টি করে তাও চাকচিক্যের আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

উন্নত দেশ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদে অব্যাহত আছে এমন দেশকে বলে উন্নত দেশ। উন্নত দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারও বেশি এবং সে কারণে জীবনযাত্রা অত্যন্ত উন্নত। এসব দেশে আর্থসামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত উন্নত, শিল্পখাত সম্প্রসারিত, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনীতির অনুকূল। দেশের সকল জনগণের আবাসন, শিক্ষাসুবিধা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়। শিক্ষার প্রসারের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানও দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপীয় দেশসমূহ, যেমন-ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে, এশীয় দেশসমূহের মধ্যে জাপান ইত্যাদি বিশ্বের উন্নত দেশ। এসব উন্নত দেশের নিম্নোক্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

১. জীবনযাত্রার উচ্চমান : উন্নত দেশসমূহের প্রধান লক্ষণ হলো এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। তাদের জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত উচ্চ। ২০২৩ সালের বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের প্রধান কয়েকটি উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল বার্ষিক ৩৯,০০০ মার্কিন ডলার থেকে ১০২,৪৬০ মার্কিন ডলারের মধ্যে।

২. শিল্পায়িত অর্থনীতি : উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি শিল্পনির্ভর। দ্রুত শিল্পায়নের ফলেই এসব দেশ উন্নতি অর্জন করেছে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে এসব দেশ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প থেকে এসব দেশে ক্রমে মৌলিক ও বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

৩. সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের উচ্চহার : উচ্চ মাথাপিছু আয়ের কারণে ভোগব্যয় করার পরও জনগণের কাছে উদ্বৃত্ত আয় থাকে যা সঞ্চয় হিসেবে জমা হয়। সঞ্চয়ের উচ্চহারের ফলে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের হারও উচ্চ। ফলে উৎপাদনের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

৪. উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও বটন প্রক্রিয়া : উন্নত দেশসমূহ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হয় ততই তাদের উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়। উন্নত উৎপাদনের একটি বড় কারণ প্রযুক্তির (Technology) উন্নয়ন। উন্নত প্রযুক্তির কারণে বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। উন্নত দেশে জাতীয় আয় বটন ব্যবস্থাও উন্নত। উৎপাদনের উপাদানসমূহ বিশেষত শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি পায়। ফলে আয়বটনে বৈষম্য হ্রাস পায়। এতে জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

৫. উন্নত আর্থসামাজিক অবস্থা : উন্নত দেশসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এসব দেশের উন্নত আর্থসামাজিক অবকাঠামো। এর মধ্যে রয়েছে—

- উন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা ও ঋণদান ব্যবস্থাপনা
- উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকারত্বের অত্যন্ত নিম্নহার
- বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানির পর্যাপ্ততা
- শিক্ষার উচ্চহার, সকলের জন্য শিক্ষাসুবিধা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও
- সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

কাজ

একক : উন্নত দেশ চিহ্নিত করার জন্য
কোন কোন নির্ণায়ক ব্যবহার করবে?

৬. উন্নত ও আধুনিক কৃষিব্যবস্থা : উন্নত দেশগুলোতে কৃষি একটি অপ্রধান খাত হলেও কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। উৎপাদনের পরিমাণ ও কৃষিপণ্যের গুণগত মান উভয়ই উচ্চ।

৭. নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা ও উন্নত মানবসম্পদ : উন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে কম হওয়ায় মাথাপিছু আয় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শিক্ষার উচ্চহার, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির কারণে জনগণ মানবসম্পদে পরিণত হয়। এই জনসম্পদ দেশের উৎপাদন ও উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখে।

৮. অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য : উন্নত বিশ্বের কৃষি এবং শিল্পপণ্য উভয়েরই পরিমাণ এবং গুণগতমান উন্নত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এসব দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে অনুকূল বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এই সম্পর্কও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়।

৯. ব্যাপক নগরায়ণ : কৃষিপ্রধান অবস্থা থেকে ক্রমশ শিল্পায়ন ঘটায় ফলে এবং পথঘাট, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে উন্নত বিশ্বে গ্রামীণ অর্থনীতি শহুরে রূপ লাভ করে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরে আসতে থাকে এবং গ্রামগুলোও ক্রমশ শহুরে রূপান্তরিত হয়।

১০. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা : উন্নত দেশসমূহে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে। এখানে প্রশাসনবন্দ্র স্বচ্ছতার সাথে কাজ করে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থিতিশীল ও উন্নত। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠে ও তা বজায় থাকে।

অনুন্নত দেশ

প্রধানত মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের নিরিখে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যেসব দেশের জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশ, যথা- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের জনগণের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অনেক কম, সেসব দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। তবে শুধু মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে একটি দেশকে অনুন্নত বলা ঠিক নয়। অনুন্নত দেশ বলতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম নয়, এমন দেশকেও বোঝায়। অর্থনীতিবিদদের মতে, যেসব দেশে প্রচুর জনসংখ্যা এবং অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সহাবস্থান, সেসব অনুন্নত দেশ। অধ্যাপক র্যাগনার নার্কস বলেন, 'অনুন্নত দেশ হচ্ছে সেসব দেশ যেগুলোতে জনসংখ্যা অত্যধিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় পুঁজি বা মূলধন কম।' এসব দেশে প্রাথমিক পেশার প্রাধান্য, পুঁজির স্বল্পতা ও ব্যাপক বেকারত্ব বিদ্যমান। অনুন্নত দেশের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. নিম্ন মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার নিম্নমান : অনুন্নত দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ হলো উন্নত দেশের তুলনায় জনগণের অত্যন্ত কম মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার নিম্নমান। জনগণের বৃহত্তর অংশেরই মৌলিক চাহিদাসমূহ, যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি পূরণ করার সামর্থ্য থাকে না।

২. কৃষির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা : অনুন্নত দেশের জনগণের বৃহদাংশ খাদ্য, জীবিকা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি জাতীয় উৎপাদনের একক বৃহত্তম খাত।

৩. অনুন্নত কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা : অনুন্নত দেশে অধিকাংশ জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তবে এসবদেশে কৃষি উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা অনুন্নত। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা, স্বল্প বিনিয়োগ, কৃষি উপকরণ ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও উপাদান, যথা- সার, বীজ, সেচ ও বিপণন সুবিধার অভাব, কৃষির প্রকৃতি নির্ভরতা প্রভৃতি কারণে কৃষি অত্যন্ত অনুন্নত।

৪. ক্ষুদ্র ও অনুন্নত শিল্প খাত : পুঁজি এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবের কারণে অনুন্নত দেশে শিল্প খাত অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সীমিত। এসব দেশে মৌলিক বা ভারী শিল্প নেই। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পেরই প্রাধান্য দেখা যায়। সাধারণত মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান শতকরা মাত্র ৮ থেকে ১০ ভাগ।

৫. মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার এবং ব্যাপক বেকারত্ব : অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কম বলে জনগণের আয়ের সবটাই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভোগের জন্য ব্যয় করতে হয়। এ কারণে জনগণের সঞ্চয়ের হার অত্যন্ত কম। ফলে মূলধন বা পুঁজির স্বল্পতা দেখা দেয় এবং বিনিয়োগের হার নিম্নমুখী হয়। বিনিয়োগ খুব কম বলে নতুন উৎপাদন বা শিল্প স্থাপনের গতি খুব মন্ডর। ফলে নতুন কর্মসংস্থান হয় না। বেকারত্ব বেড়ে যায়। মাথাপিছু আয় কম হতে থাকে। এইভাবে দারিদ্র্যের চক্রে দেশটি আবর্তিত হয়।

৬. প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির অসম্পূর্ণ ব্যবহার : প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন মূলধন বা পুঁজি এবং দক্ষ জনশক্তি। অনুন্নত দেশে পুঁজি এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির এতই অভাব যে, দীর্ঘকাল ধরেও দেশে কী কী খনিজসম্পদ কী পরিমাণে আছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ফলে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এসব দেশ দরিদ্র থেকে যায়।

৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং অদক্ষ জনশক্তি : অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং যথাযথ নিয়ন্ত্রণের অভাবে অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উচ্চ। দেশের পরিপোষণ ক্ষমতার চেয়ে জনসংখ্যার আয়তন বড়। এই জনসংখ্যাকে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সুবিধা সরবরাহের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থাও নগণ্য।

৮. দুর্বল আর্থসামাজিক অবকাঠামো : অনুন্নত দেশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় প্রকার অবকাঠামোর দুর্বলতা। কৃষি ও শিল্পে স্বর্ণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অপরিপাক। এগুলোর ব্যবস্থাপনা দুর্বল। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থাও অনুন্নত ও অপরিপাক। জনগণের বৃহত্তর অংশই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ অত্যন্ত অপ্রতুল।

৯. প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য : অনুন্নত দেশগুলো জনগণের মৌলিক চাহিদা এমনকি খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার চাহিদা পূরণের জন্যও আমদানিনির্ভর। এসব দেশ প্রধানত কৃষিপণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল রপ্তানি করে এবং শিল্পপণ্য আমদানি করে। রপ্তানি আয় সবসময়ই আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম। ফলে এসব দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যে সবসময়ই ঘাটতি থাকে।

১০. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা : পুঁজির স্বল্পতার কারণে অনুন্নত দেশসমূহ বিনিয়োগের লক্ষ্যে পুঁজি সংগ্রহের জন্য বিদেশি সাহায্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল থাকে। শুধু পুঁজির জোগান দেওয়ার জন্যই নয়, দুর্যোগ ও আপৎকালেও প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য এসব দেশ অতিমাত্রায় বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

কল্প
একক : কোনো দেশের অনুন্নত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

১১. উদ্যোগ ও ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতার অভাব : অনুন্নত দেশগুলোতে জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জনশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক কার্যাবলির অগ্রগতি যেমন পুঁজির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি

দক্ষ উদ্যোক্তাও এর জন্য অপরিহার্য। এছাড়া দুর্বল অবকাঠামো এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে পুঁজিপতিরা বিনিয়োগে আগ্রহী হন না। গতানুগতিক ধারায় বিনিয়োগ শুরু হয়। নতুন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার উদ্যোগ ও ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতার অভাব রয়েছে। ফলে অর্থনীতিতে নতুন প্রাণসঞ্চার হয় না এবং অনুন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদি হয়।

উন্নয়নশীল দেশ

বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যপর্ষায়ে আরেক ধরনের দেশ আছে—যেগুলোকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ। এসব দেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনুন্নত অর্থনীতির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষিখাতের প্রাধান্য, শিল্প খাতের অনগ্রসরতা, ব্যাপক বেকারত্ব, পরিবহন, যোগাযোগ ও বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা, শিক্ষার নিম্নহার, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার, নিম্ন মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার ইত্যাদি।

তবে অনুন্নত দেশসমূহের সাথে এ দেশগুলোর পার্থক্য এই যে, এসব দেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যাকে ব্যবহার করে মোট জাতীয় উৎপাদন তথা মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসব দেশ আর্থসামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও দেশের দ্রুত শিল্পায়ন করার প্রচেষ্টা নেয়। ফলে পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয় এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এইসব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে অর্থনীতিতে বিরাজমান উন্নয়নের প্রতিকল্পকতাসমূহ দূর হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে সচেতনতা ও পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ : উন্নয়নশীল দেশ হচ্ছে সেসব দেশ যারা নিজেদের অর্থনীতির উন্নয়নের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা পরিবর্তনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপের সূচনা হয় সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানারকম বাধাবিঘ্ন থাকে। বস্তুত জনসংখ্যাধিক্য ও সম্পদের স্বল্পতার কারণে পরিকল্পিত কর্মসূচি ছাড়া উন্নয়ন অর্জন করা যায় না।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা : উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন—ভূমি, খনিজসম্পদ, পানিসম্পদ প্রভৃতি রয়েছে। জনসংখ্যার আয়তনও বড়ো। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৩. কৃষির ওপর নির্ভরতা হ্রাস ও দ্রুত শিল্পায়ন : কৃষিপ্রধান অবস্থা থেকে ক্রমশ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হওয়ার ধারা উন্নয়নশীল দেশের লক্ষণ। এ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে মৌলিক শিল্পস্থাপন ও শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

৪. কৃষির ক্রমোন্নতি : উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষির আধুনিকায়ন করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষির অবকাঠামো উন্নয়ন, উন্নতমানের বীজ, সার ও সেচসুবিধা সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ে। কৃষিতে ক্রমোন্নতির সূচনা হয়।

৫. অবকাঠামো উন্নয়ন : কৃষি ও শিল্পের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় বিধায় উন্নয়নশীল দেশে আর্থসামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই এসব দেশে উন্নয়ন শুরুর পর্যায়েই অর্থনৈতিক অবকাঠামো, যেমন- পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, মূলধন গঠন ও সরবরাহ এবং সামাজিক অবকাঠামো, যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই উন্নয়ন অর্জনের ধারায় ক্রমশ সামাজিক পরিবেশেরও উন্নতি ঘটে।

৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস ও মানবসম্পদ উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যাবিক্য রয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরে হলেও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। দেশের জনগোষ্ঠীকে জনশক্তি বা মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য সাক্ষরতা প্রকল্প গ্রহণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিস্তার এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যসুবিধা ও সেবার সম্প্রসারণ ঘটে। এসব কারণে জনগণ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়। তাদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৭. বেকারত্ব হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন : উন্নয়নশীল দেশেও ব্যাপক বেকারত্ব বিদ্যমান। তবে কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও দ্রুত শিল্পায়ন এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের হার কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সাধারণত উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় নানারকম প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করার ও দারিদ্র্য নিরসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৮. বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস : উন্নয়নশীল দেশসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ও মূলধনের প্রয়োজন হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় এসব দেশ বিদেশি ঋণ, সাহায্য ও অনুদানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ নির্ভরশীলতা সাধারণত দীর্ঘদিন চলতে থাকে। তবে উন্নয়ন অর্জনের এক পর্যায়ে এ নির্ভরতা কমে আসে।

৯. জনগণের আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য সকল জনগণের সর্বাধিক আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আয়ের সুবম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারলে আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সূচিত হলেও বণ্টনব্যবস্থায় ত্রুটি দীর্ঘসময় থেকে যায়। ফলে আয় বণ্টনে বৈষম্য প্রলম্বিত হয়।

১০. নগরায়ণের হার বৃদ্ধি : উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে একটি ক্রমোন্নতির ধারা সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো দেশে এ ধারা খুব বেগবান। কোনো কোনো দেশে ততটা নয়। তবে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে ক্রমশ গ্রামীণ অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটে। শিল্পায়নের ফলে কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে জনগণ শহরমুখী হয়। এসব কিছুর ফলে দেশে নগরায়ণ ঘটে।

কাজ

একক : কোনো দেশকে 'উন্নয়নশীল' বলা হলে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে?

১১. সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশসমূহে ধীরগতিতে হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন ব্যবস্থা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন- ব্যাংক ও বিনা), আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ইত্যাদি উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে কুসংস্কার ও গৌড়ামি দূর হয়। উন্নত জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে মানুষ উন্নয়ন অর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১২. মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি : উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি প্রধানত পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা বাস্তবায়নের ফলে উন্নতির একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ফলে এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন সূচিত হয়।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

আমরা জেনেছি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা বা স্তর অনুসারে বিশ্বের দেশগুলোকে উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনূন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে ভাগ করা হয়। এ ভাগ অনুসারে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত। তবে অব্যাহত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম এবং আর্থসামাজিক কিছু সূচকের (যেমন- শিক্ষায় জেল্ডার সমতা, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রভৃতি) উচ্চমানের কারণে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের দেশগুলোর অধিকাংশই উন্নত দেশের শ্রেণিভুক্ত। দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলো প্রধানত নিম্ন আয়ের দেশ। এছাড়া পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলো, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকান দেশগুলো প্রধানত ‘মধ্য আয়ের দেশ’। এসবের মধ্যে ‘নিম্ন মধ্য আয়’ ও ‘উচ্চ মধ্য আয়’ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীতে কোনো দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণেও প্রতিটি দেশকে প্রতিবেশী দেশসহ অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আমরা এ পাঠে পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করব।

অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি আমরা দু’টি প্রধান শিরোনামে আলোচনা করতে পারি : ১. বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক ও ২. ঋণ সহায়তা ও অনুদান দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক।

১. বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক

বাণিজ্যের দু’টি দিক আছে— রপ্তানি ও আমদানি। রপ্তানি হচ্ছে কোনো দেশের আয়ের উৎস আর আমদানি ব্যয়ের খাত। বাংলাদেশের রপ্তানি আয় দীর্ঘ সময় ধরেই আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবসময়ই একটি ঘাটতির দেশ। তবে সাম্প্রতিককালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, প্রবাসীদের আয়প্রবাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক ও নিটওয়ার, কাঁচা পাট, পাটজাত পণ্য, চিংড়িমাছ, হিমায়িত খাদ্য, চা, চামড়া, কৃষিজাত পণ্য, সিরামিক ইত্যাদি।

দেশভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্যের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত এক দশক যাবত বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড়োবাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি দেশ। এছাড়া ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা এসব দেশেও আমাদের পণ্য রপ্তানি হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রধানত উন্নত দেশগুলোতেই বিস্তৃত।

আমাদের রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো আমরা একটি জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করি। এসব দেশে নানারকম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেসব দেশে

বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রধান দেশগুলো হচ্ছে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, যেমন- সৌদি আরব, আরব আমিরাতে, কাতার, ওমান, বাহরাইন ও কুয়েত। এছাড়া আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উন্নত দেশসমূহ ছাড়া সার্ক (SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation) দেশসমূহের সাথেও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে।

ভারত ছাড়াও সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ, যেমন- ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আমাদের পণ্য রপ্তানি হয়।

আমাদের প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকায় আছে মূলধনি যন্ত্রপাতি, শিল্পের কাঁচামাল, খাদ্যপণ্য, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, তুলা, ভোজ্যতেল, সার, সুতা ইত্যাদি।

কাজ

দলগত : উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের নির্ভরতা নিয়ে একটি বিতর্কমূলক আলোচনা কর।

বিগত এক দশকের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পণ্য আমদানি করে এমন দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কখনো চীন কখনো ভারত। বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর, জাপান, হংকং, তাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়া।

২. বৈদেশিক ঋণ সহায়তা ও অনুদান

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য এদেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ দরকার হয়। এই অর্থের সবটা দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। উন্নয়ন তহবিল সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ঋণ সহায়তা ও অনুদান গ্রহণ করে। উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা ও অনুদান দানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন- বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU), জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (IDA) প্রভৃতি থেকেও বাংলাদেশ ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে বৈদেশিক সাহায্য পায়, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক। এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সাহায্যদাতা দেশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাপান।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপাদানসমূহের মোট আয় কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ব্যাখ্যা কর।
২. মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের সাংকেতিক সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।
৩. কৃষি খাত বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত কেন? ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মাথাপিছু আয় কীভাবে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে? বিশ্লেষণ কর।
২. মোট দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির খাতসমূহ কীভাবে অবদান রাখে? ব্যাখ্যা কর।
৩. নিম্ন আয়ের দেশের ক্ষেত্রে জিডিপি, জিএনপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের শ্রমশক্তির মোট কত শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত?
 - ক. ১৭.৩১
 - খ. ২৪.৭৩
 - গ. ২৮.৪০
 - ঘ. ৪৫.০০
২. মোট জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি গার্মেন্টস কারখানার কোন দ্রব্যটির দাম বিবেচনা করা হবে?
 - ক. তুলা
 - খ. সুতা
 - গ. কাপড়
 - ঘ. শার্ট

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

২০১০ সালে 'X' দেশের মোট জাতীয় আয় ছিল ৯৬০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি।

৩. ২০১০ সালে 'X' দেশের মাথাপিছু আয় কত মার্কিন ডলার ছিল?
 - ক. ৪০০
 - খ. ৫০০
 - গ. ৬০০
 - ঘ. ৭০০

৪. উক্ত সূচকটি দ্বারা প্রকাশ পায় 'X' দেশের মানুষের—

- i. জীবনযাত্রার মান
- ii. সঞ্চয়ের হার
- iii. শিক্ষার হার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অগ্নিমা তার পরিবারের সদস্যদের সাথে মাইক্রোবাসে করে কুয়াকাটায় বেড়াতে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় দুটি ফেরি তারা নির্বিঘ্নে পার হলো। কিন্তু মহীপুরের ফেরি পার হতে গিয়ে দেখে যে, ব্যাপক জগোচ্ছ্বাসের কারণে ফেরিসংলগ্ন পল্টনের তিন-চতুর্থাংশ পানির নিচে ডুবে গেছে। তাদেরকে ফেরি পার হওয়ার জন্য সেখানে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অগ্নিমার বাবা সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে কণ্ঠা বলে জানানতে পারেন, সরকার এ ধরনের অবস্থা মোকাবিলায় জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

- ক. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি কী?
- খ. বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়?
- গ. অগ্নিমা ও তার পরিবার কুয়াকাটা যাওয়ার পথে দেশের কোন ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. অগ্নিমার বাবার জানা প্রকল্পটি কি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে? তোমার উদ্ভরের সপক্ষে যুক্তি দাও।